অনন্য বিদ্যাসাগর

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : দ্বিশতজন্মবর্ষ স্মারক সংকলন)

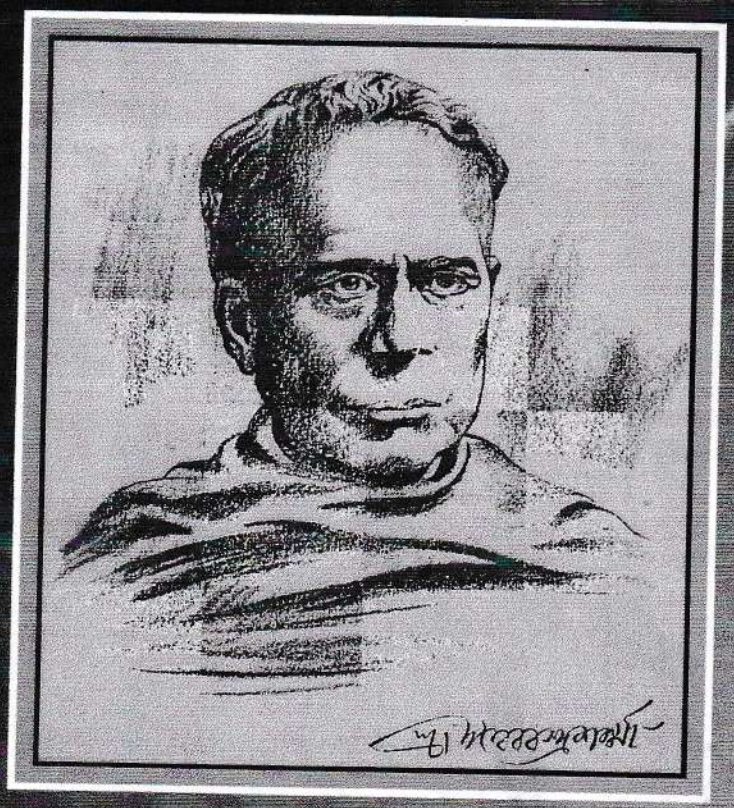

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

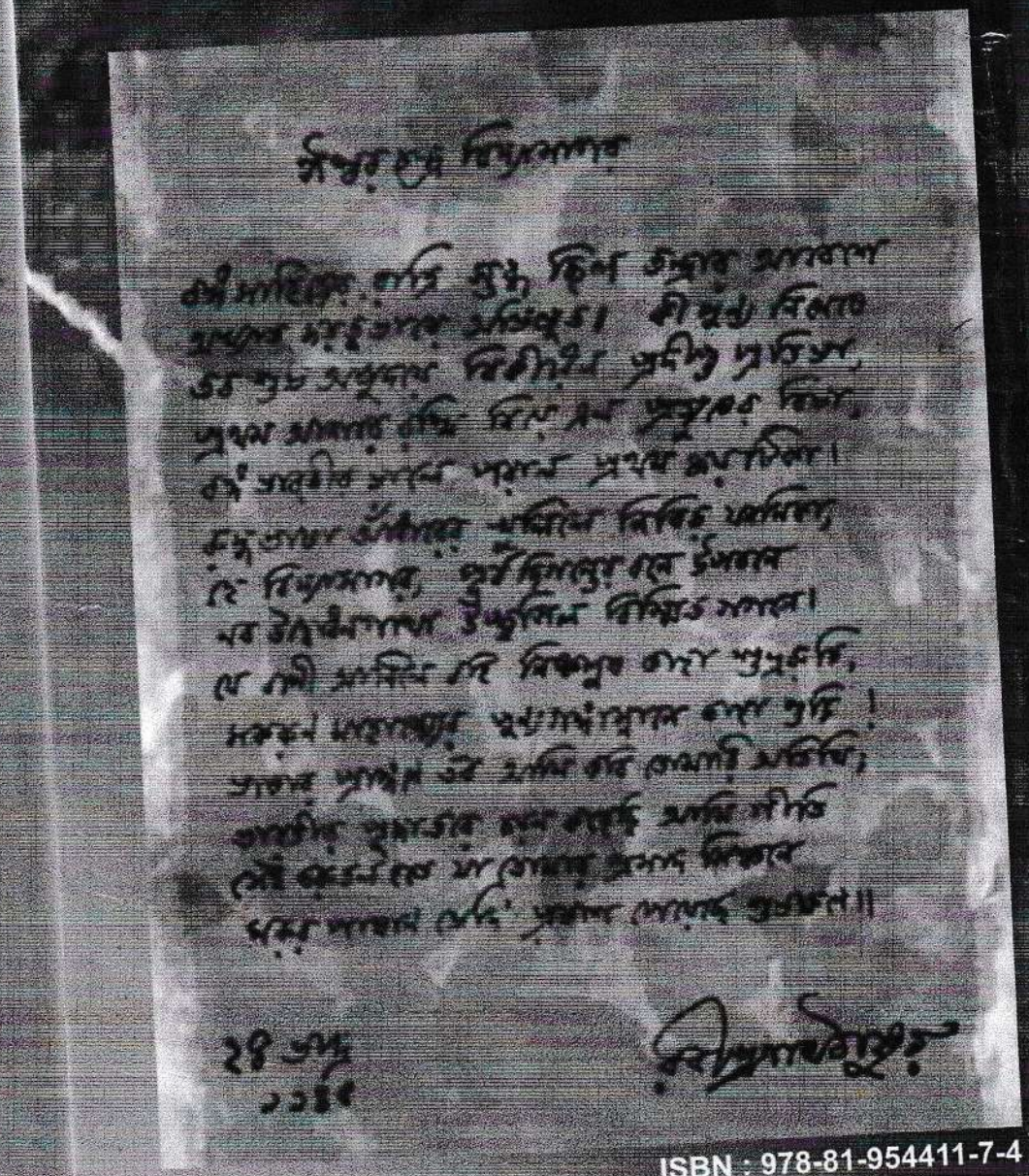

ISBN : 978-81-954411-7-4

শিক্ষণ
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
চলভাষ ঃ ৯১৪৩৫০৫৫০৩, ৯৪৩৩২৭১০৪৫
ই-মেল ঃ gopipalui@gmail.com

মূল্য ঃ দুই শত টাকা মাত্র।

2021

Published by the Vidyasa
Midnapore-721102 and Pr

১৬. ড. তপন হাজরা, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, গৌরবগুইন মেমোরিয়াল কলেজ, চন্দ্রকোণা রোড।

১৭. ড. দুলাল চন্দ্র পাণ্ডে, সহ-শিক্ষক, হেলেঞ্চা উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা।

১৮. শ্রী অশোক পাল, প্রাক্তন সহ-শিক্ষক, খুকুড়দহ হাইস্কুল।

১৯. শ্রী উত্তম দোলাই, সহ-শিক্ষক, তালাবান্দী লালা বাহাদুর শাস্ত্রী শিক্ষা নিকেতন।

২০. ড. নির্মল কুমার বর্মন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়।

২১. শ্রী শঙ্কর আদক, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, গড়বেতা কলেজ।

২২. শ্রীমতি সুরঞ্জনা জানা, গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)।

২৩. শ্রীমতি সুলগ্না ব্যানার্জী, গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)।

২৪. আকবর আলি শাহ, সেক্ট, ইতিহাস বিভাগ, গৌরবগুইন মেমোরিয়াল কলেজ, চন্দ্রকোণা রোড।

ন্দ্র — ফণীভূষণ রায়চৌধুরী
— তারাপদ রায়চৌধুরী
— গিরিজাভূষণ রায়চৌধুরী

— উষা

-১৯৩৩ — সুশীলকুমার (অবিবাহিত)
— সুষমা

— সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য
— দেবব্রত ভট্টাচার্য্য
না — শিবব্রত ভট্টাচার্য্য
— শান্তি ভট্টাচার্য্য

মার — নিঃসন্তান

মার — সন্তোষকুমার ১৯২৩–
— সুহাসকুমার – অমিতাভ

— মণীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
না — শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
— আশা চট্টোপাধ্যায়

মার (নিঃসন্তান)
৪

ট্টাচার্য
ট্টাচার্য

অধিকারী

চট্টোপাধ্যায়
থি চট্টোপাধ্যায়

— নগেন্দ্রনাথ – বীরেন্দ্র – পার্থসারথি

লেখক পরিচিতি :

১. ড. রীণা পাল, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহি মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)।

২. ড. সুজয়কুমার মাইতি, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খা মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)।

৩. ড. বিপুলকুমার মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খা মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত)।

৪. ড. তপন কুমার দে, প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. ড. তরুণ কান্তি নস্কর, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগ, সহ-সভাপতি, পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

৬. ড. শ্রুতিনাথ প্রহরাজ, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যাল শিক্ষক সমিতি।

৭. ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮. ড. নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রা কলেজ।

৯. ড. নিবেদিতা চক্রবর্তী, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, পিংলা থা মহাবিদ্যালয়।

১০. শ্রী লক্ষ্মণ কর্মকার, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঘাটাল রবী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়।

১১. ড. কপোতাক্ষী সুর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষি মহাবিদ্যালয়।

১২. ড. মনমোহন গুরু, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, চন্দ্রকোণা বিদ্যাসাগ মহাবিদ্যালয়।

১৩. ড. মৃণাল কান্তি দে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, পালপাড়া যোগদা সৎস মহাবিদ্যালয়।

১৪. ড. রাখালচন্দ্র ভূঞ্যা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, খড়্গপুর কলেজ।

১৫. শ্রী টিংকু কুমার ঘোড়াই, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, গৌরবগুই মেমোরিয়াল কলেজ, চন্দ্রকোণা রোড।

বিধবা বিবাহ : ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

শঙ্কর আদক

আজ থেকে দু'শ বছর আগে আমাদের দেশ ছিল অশিক্ষা, কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা, জাতপাত এবং ধর্মান্ধতায় দীন। শুধু তাই নয়, সমাজে শ্লেষ সহ্য হয় না রক্ষণশীলদের। তখনও নয়। এখনও নয়। প্রথমে তাঁরা ক্ষিপ্ত হন। তারপর সামাজিক আক্রমণ শানান। শেষে প্রাণ নাশও। এমনি অবস্থার অবসানে মর্তলোকে নরদেবতা রূপে আবির্ভূত হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরে অন্যতম কীর্তি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। সবে সমাজের বর্বর, নির্মম কুপ্রথা সহমরণ রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় রদ হয়েছে। সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই সহমরণ প্রথা রদ হওয়ায় বিধবী নারীরা সমাজে প্রানে বাঁচলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজ বড় নির্মম। বিধবা মহিলাদের জীবন যাপনে যে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ ছিল তা নিদারুণ দুঃখ যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট এক অন্ধকারময় যুগ।

তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি ছিল ৪-৫ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে হত। বিয়ে না দিলে সমাজে ঠাঁই হত না। শুধু তাই নয় বিয়ে দিতে হত ৬০-৭০ বছরের কুলীন বৃদ্ধের সঙ্গে। এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণের ৫০-৬০ জন করে স্ত্রী থাকত। এই কুলীন ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হলে ৫০-৬০ মহিলা বিধবা হত। এবং বিধবাদের জীবন-যাপন ছিল বেঁচে মরার মতো। ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই বিদ্যাসাগর 'বাল্যবিবাহের দোষ' রচনা করেন। তার অংশ বিশেষ উল্লেখ্য–

> "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসারে তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতি বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতি বিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগনুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপয়ে হইয়া যায়, তথাপি নির্দ্দায় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডুষমাত্র বারি বা ঔষধ দানের ও অনুমিতি দেন না।"

শশিভূষণ সিংহ বিদ্যাসাগরের আপন গ্রামের মানুষ। এক সময়ে বিদ্যাসাগরের মুখে অল্পবয়সী একটি বিধবার দুঃখের কাহিনী শুনেছিলেন শশিভূষণ। শশিভূষণ বলেছেন–

> "বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্য সহচরী ছিল। সেই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন

> কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু কয়েকমাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল ? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়ে জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই; সে দিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩/১৪ বৎসর মাত্র হইবে।"

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। দিনের পর দিন ভেবেছেন বিদ্যাসাগর। দিনের পর দিন পুঁথির পাতায় পাতায় খুঁজেছেন। কেননা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এটাই রীতি যে কোন প্রচলিত প্রথা ভাঙতে গেলে শাস্ত্রের বিধান প্রয়োজন। রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

> "১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে একদিন রাত্রি কালে আমি পড়িতে ছিলাম, তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশর সংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দ বেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন– 'পাইয়াছি, পাইয়াছি।' আমি জিজ্ঞাসিলাম– 'কে পাইয়াছ ?' তিনি তখনই পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটি আওড়াইলেন–
>
> "নষ্টে মৃতেপ্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধিয়তে।"

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। "(বিদ্যাসাগর) বিধবা বিবাহ বিষয়ক একখানি শাস্ত্র সম্মত ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্বপ্রথম পিতার নিকট গিয়া বলিলেন– "দেখুন আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমান সংগ্রহ করিয়া বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রনয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে ইহা প্রকাশ করিতে পারি না। পিতা পুত্রকে বলিলেন– "যদি আমি এ বিষয়ে আমার মত না দিই তবে তুমি কি করিবে ? পুত্র বলিলেন, তাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। পিতা বলিলেন, "আচ্ছা কাল একবার নির্জনে বসিয়া মনোযোগ সহকারে সকল বিষয় শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব। পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা সমস্ত শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে ? পুত্র বলিলেন, হ্যাঁ, আমার তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" তখন পিতা বলিলেন, "তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা